স চি ত্র কি শো র ক্লা সি ক সি রি জ ০ ৬

আ ক্রিসমাস ক্যারল

চার্লস ডিকেন্স

রূপান্তর

মাসুদ আনোয়ার

বেঙ্গলবুকস

চার্লস ডিকেন্স

চার্লস ডিকেন্স (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮১২—জুন ১৮৭০) দক্ষিণ ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ছেলেবেলা কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। স্কুলে ভর্তি হলেও মাঝে মাঝে পড়াশোনা বন্ধ রেখে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য কলকারখানায় কাজ করেছেন।

১৮৩৬ সালে লেখেন *দ্য পিকউইক পেপার্স* নামের বই। বইটি তাকে পরিচিতি এনে দেয়। এরপর একে একে লেখেন *অলিভার টুইস্ট, নিকোলাস নিকোলবি, দি ওল্ড কিউরিওসিটি শপ, বার্নাবি রাজ, আ ক্রিসমাস ক্যারোল, মার্টিন চাজলউইট, ডম্বি অ্যান্ড সন, ডেভিড কপারফিল্ড, ব্লীক হাউস, হার্ড টাইমস, লিটল ডরিট, আ টেল অফ টু সিটিজ, গ্রেট এক্সপেক্টেশনস* ইত্যাদি।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় । এবেনেজার স্ক্রুজ ০৭

দ্বিতীয় অধ্যায় । ওয়্যারহাউসে ভিজিটর ১৩

তৃতীয় অধ্যায় । মার্লের ভূত ৩৩

চতুর্থ অধ্যায় । অতীত বড়দিনের ভূত ৫৯

পঞ্চম অধ্যায় । বর্তমান বড়দিনের ভূত ১০১

ষষ্ঠ অধ্যায় । ভবিষ্যৎ বড়দিনের ভূত ১৪৯

সপ্তম অধ্যায় । ক্রিসমাস ডে ২০৫

অষ্টম অধ্যায় । ববের নতুন বস ২২৯

নবম অধ্যায় । নতুন এক এবেনেজার স্ক্রুজ ২৩৭

এবেনেজার স্ক্রুজ কাগজে সই করছেন

এবেনেজার স্ক্রুজ

জ্যাকব মার্লে মারা গেছে। সবাই জানে। কারও মনে একটুও সন্দেহ নেই। তার মৃত্যু নিয়ে আনুষ্ঠানিক সব কাগজপত্র সই হয়ে গেছে। সাক্ষীসাবুদও আছে। গির্জার পাদ্রি নিজ হাতে সই করেছেন। সিটি ক্লার্কের সইও হয়ে গেছে। মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব যার, তিনি নিজেও সই করেছেন। এমনকি এবেনেজার ক্রুজ নিজেও। আর সবাই জানে এবেনেজার স্ক্রুজ যেখানে সই করেন, সেটা পুরোপুরি আইন মেনেই করেন।

হ্যাঁ, মার্লে যে আর বেঁচে নেই, সেটা একদম চাঁদ-সূর্যের মতো সত্যি। এবেনেজার স্ক্রুজও কি সেটা জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। কেউ একজন মারা যাবে, আর তিনি সেটা জানবেন না, তা কী করে হয়! সবচেয়ে বড় কথা হলো, বেঁচে থাকতে বহু বছর স্ক্রুজ আর মার্লে ব্যবসায়িক সঙ্গী ছিলেন। তা ছাড়া স্ক্রুজ মার্লের এস্টেটের পরিচালক ছিলেন। সুতরাং মার্লের

মৃত্যুর খবর কোনোভাবেই তার না জানার কথা নয়। স্ক্রুজ ছিলেন মার্লের একমাত্র বন্ধু, তার মৃত্যুতে একমাত্র শোকাতুর মানুষ। আর তার মৃত্যুতে একমাত্র লাভবান মানুষও। কারণ, মার্লের এস্টেটের মালিকানা এখন তার।

স্ক্রুজ অবশ্য একজন চতুর ব্যবসায়ীও। মার্লের মৃত্যুর এত বছর পরেও তিনি খদ্দেরদের সঙ্গে মার্লের কথা তুলে বেশ ভালোই দর কষাকষি করে থাকেন।

হ্যাঁ, মার্লে মারা গেছেন, সেটা স্ক্রুজ ভালো করেই জানেন। কিন্তু তাদের ওয়্যারহাউসের দরজায় তার নামের সঙ্গে এখনো মার্লের নামও লেখা রয়েছে। সাইনবোর্ডে এখনো লেখা আছে : স্ক্রুজ অ্যান্ড মার্লে।

কী কারণে মার্লের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে না, সেটা আর কেউ না জানুক, স্ক্রুজ ভালোভাবেই জানেন।

কিন্তু স্ক্রুজ লোকটা বুড়ো হয়ে গেলে কী হবে, হাড় কিপ্টে। হাতের মুঠো কখনো আলগা হয় না। একটা পয়সাও তার কাছ থেকে কেউ বের করতে পারে না। যারা তার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়, আদায়ের বেলায় কাউকে তিনি এক পয়সাও রেয়াত করেন না। তার এখানে যারা কাজ করে, তাদের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ের পুরোটা জুড়েই কাজ উসুল করে নেন। ঠান্ডা মাথার কঠিন মানুষ স্ক্রুজ, ভেতরে বাইরে একই রকম। সরু নাক, তোবড়ানো গাল, লাল চোখ,

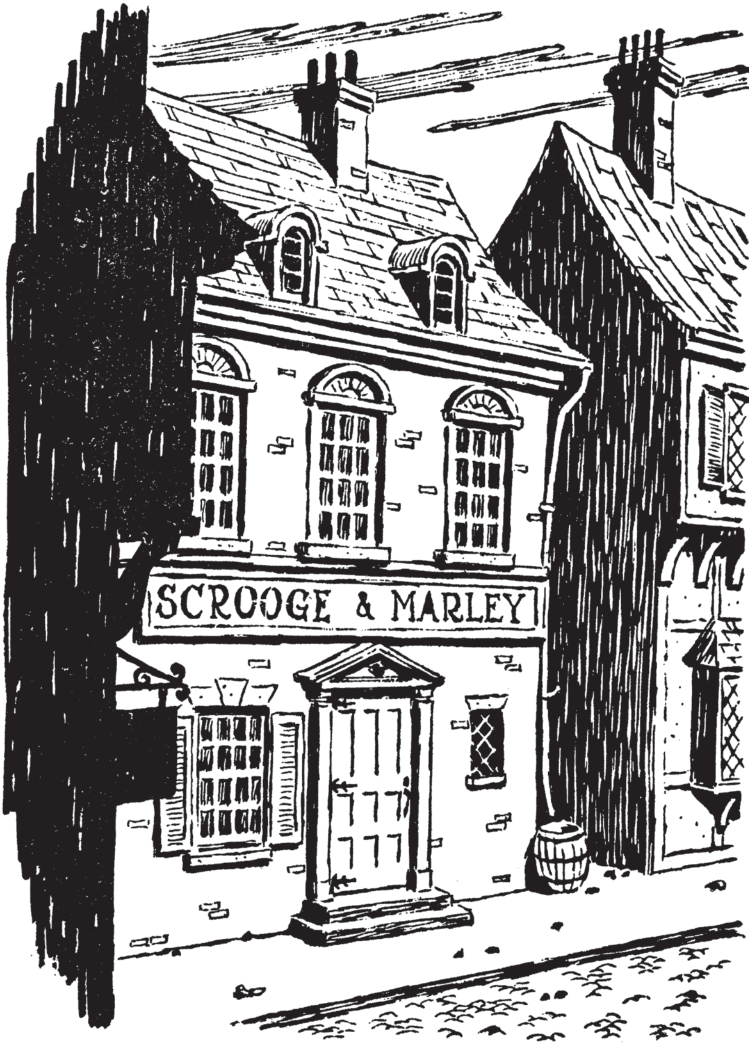

স্ক্রুজ আর মার্লের গুদামঘর

নীল রঙের পাতলা চিমসানো ঠোঁট, কুঁচকানো চিবুক আর মোটা কর্কশ গলার স্বর।

নিজে যেমন ঠান্ডা চুপচাপ, তার চারপাশটাও তেমনি। অফিস বরফের মতো শীতল। সামান্যতম উষ্ণতাও অনুভব করা যেত না, এমনকি ক্রিসমাসের মতো উৎসবমুখর সময়েও।

কিন্তু ঠান্ডা বা গরম নিয়ে মাথা ঘামাতেন না স্ক্রুজ। চারপাশের মানুষজন নিয়ে কোনো আগ্রহ ছিল না। রাস্তায় মাথা নিচু করে নিজের মনে হেঁটে যেতেন, কেউ তার দিকে কখনো হাসিমুখে তাকাত না। কেউ কখনো জানতে চাইত না, 'মি. স্ক্রুজ, আপনি কেমন আছেন?'

কেউ কখনো বলত না, 'আপনি তো কখনো আমাদের বাড়িতে বেড়াতে-টেড়াতে যান না।'

রাস্তার ভিক্ষুকটাও তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানাত না। কোনো বাচ্চা তার কাছে সময় জানতে চাইত না। কোনো নারী বা পুরুষ তার কাছে কোনো কিছু জানতে চাইত না। এমনকি অন্ধ যে লোকটা, তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া কুকুরটাও তার ঘরের সামনে দাঁড়াত না। রাস্তায় স্ক্রুজকে আসতে দেখলে তারা দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে চলে যেত।

তবে তাতে স্ক্রুজের কিছুই আসত যেত না। তার বরং ভালোই লাগত। সারা জীবন তিনি লোকজনের কাছ থেকে নিজেকে সন্তর্পণে দূরে রাখতে চাইতেন।

এমনকি অন্ধ লোকটার কুকুরও স্ক্রুজকে এড়িয়ে চলে

স্ক্রুজ কাজে ব্যস্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়্যারহাউসে ভিজিটর

ক্রিসমাসের আগের দিন। বিকেলবেলা নিজের অফিসে কাজে ব্যস্ত বুড়ো স্ক্রুজ। দিনটা ঠান্ডা, কুয়াশাচ্ছন্ন আর ঘোলাটে। অফিস ঘরটা নীরব, প্রাণহীন। তবে পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তা থেকে নানা রকম শব্দ আসছে কানে। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডায় গা গরম রাখার জন্য তারা রাস্তার পাশের পাথরে তৈরি ফুটপাতে জোরে জোরে পা ফেলে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে।

মাত্র তিনটা বাজে। কিন্তু এরই মধ্যে আঁধার নেমে এসেছে। কাছেপিঠের অফিসগুলোর জানালা দিয়ে মোমের আলো বেরিয়ে আসছে। ভারী কুয়াশায় অন্ধকার যেন পুরু চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। জানালার ফাঁকফোকর অথবা দরজার কী-হোল দিয়ে যেন ভেতর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসছে আলোর ফুলঝুরি।

অফিসে স্ক্রুজ যে ঘরে বসে কাজ করছেন, তার দরজা খোলা। পাশে ছোট্ট, ঠান্ডা একটা ঘরে বসে চিঠিপত্তর লেখার কাজ করছে কেরানি। তার ওপর চোখ রাখার জন্য এই ব্যবস্থা। স্ক্রুজের নিজের ঘরে অবশ্য ছোট একটা ফায়ারপ্লেস। তবে কেরানির ঘরে যেটা জ্বলছে, দেখে মনে হয় ফায়ারপ্লেস নয়, ছোট্ট এক টুকরো কয়লা যেন অন্ধকারে মিটমিট করে নিজের অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। ফায়ারপ্লেসটা নিভে যাচ্ছে, কিন্তু কেরানি তাতে জ্বালানি ফেলতে পারছে না। কয়লার বাক্সটা স্ক্রুজের নিজের ঘরে। ওর সাহসে কুলোচ্ছে না যে উঠে এসে কয়লা নিয়ে যাবে। কয়লার জন্য গেলে স্ক্রুজ নির্ঘাত খেঁকিয়ে উঠবেন। সুতরাং কেরানি, বব ক্র্যাচিট, বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে টেবিলে রাখা মোমবাতির আগুনে হাত সেঁকে নিয়ে নিজেকে গরম রাখার চেষ্টা চালাচ্ছে। খুব একটা যে কাজ হচ্ছে, তা নয়।

এমন সময় একটা গলার শব্দ স্ক্রুজের মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাল। 'মেরি ক্রিসমাস, মামা!' একজনের সতর্ক গলা শুনলেন স্ক্রুজ। তাকিয়ে দেখলেন। ফ্রেড, তার ভাগ্নে। তরুণ আর সুদর্শন ভাগ্নের উজ্জ্বল মুখে খুশির ভাব, চোখ দুটোতে আনন্দের ঝিলিক।

'বাহ্! হামবাগ!' কাজ থেকে মাথা তুললেন না স্ক্রুজ।

'তুমি ক্রিসমাসকে হামবাগ বলছ, মামা? নিশ্চয় না।

‘মেরি ক্রিসমাস, আঙ্কেল!’

বব ক্র্যাচিট ফ্রেডের কাজের প্রশংসা করে